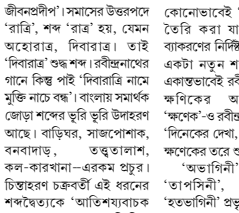

রাইফেল ফ্যাক্টরি থেকে অস্ত্রপাচারের সিবিআই তদন্ত দরকার

দেশের অস্ত্র উৎপাদনের অন্যতম কেন্দ্র ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরি থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী অস্ত্র পাচার এবং মাওবাদীদের কাছে বিক্রির যে চাঞ্চল্যকর ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার। এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়, উত্তর ২৪ পরগনার ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টিরির নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢিলেঢালা ছিল এবং এই অস্ত্র পাচারের সঙ্গে কারখানার পদস্থ অফিসার এবং কর্মীরাও যুক্ত ছিলেন। এই ঘটনার সিবিআই তদন্ত দরকার। কারণ বোঝা যাচ্ছে, অস্ত্র উৎপাদনের কারখানায় সরষের মধ্যেই ভূত রয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এ ব্যাপারে সবরকম পদক্ষেপ নেবে, এটাই দেশবাসীর আশা।

ভারতে অস্ত্র তৈরির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র উত্তর ২৪ পরগনার ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরি থেকে অস্ত্রপাচারের চঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে। এখান থেকে পাচার হচ্ছিল কারবাইন, এসএলআর, রিভলবার সহ বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র। এই ঘটনার মদত দেওয়ার অভিযোগে ফ্যাক্টরির জুনিয়র ম্যানেজার সুশান্ত বসুকে আটক করেছে পুলিশ। সুশান্তবাবু সহ আরও একজন অফিসার এই ঘটনায় যুক্ত আছেন বলে আইপিএস মুরলী সাংবাদিকদের জানান। তিনি বলেন, পাঁচ বছর ধরে এই অস্ত্রপাচার কাণ্ড চলছে। ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরি থেকে ইনসাস রাইফেল এবং এসএলআর সহ অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র পাচার হয়ে যাচ্ছিল। ধৃতদের মধ্যে রয়েছে ইছাপুর রাইফেল ফ্যক্টরির দুই অফিসার, দু'জন গার্ড এবং পাচারকারীরা। পুলিশ জানিয়েছে, রাইফেল ফ্যাক্টরি থেকে ১৬টি ইনসাস অ্যাসল্ট রাইফেল, এসএলআর, মাওবাদীদের কাছে বিক্রি করা হয়েছিল এর আগে। এই ইনসাস রাইফেল ব্যবহার করে নিরাপত্তা বাহিনী জম্মু-কাশ্মীর এবং ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জঙ্গি উপদ্রুত এলাকায়। উল্লেখ্য, ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরি ১৭৮৭ সালে স্থাপিত হয়েছিল।

কলকাতা পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার ভোরে বাবুঘাট থেকে ছ'জনকে গ্রেফতার করে। পুলিশের কাছে খবর ছিল, ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরি থেকে অস্ত্র পাচার হচ্ছে এবং এর পেছনে বড়সড় চক্র কাজ করছে। এদের কাছ থেকে বেশকিছু অস্ত্র উদ্ধার হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল এই পাচারকারীরা মাওবাদীদের অস্ত্র সরবরাহ করত বলে সূত্রের খবর। পুলিশের ধারণা, অস্ত্রপাচারের নেপথ্যে বড় মাথা রয়েছে। এখান থেকে অস্ত্র পাচার হয়ে যেত বিহারের মাফিয়াদের কাছে এবং নেপালে। ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ আবার ভক্তদের সম্বোধন করিয়া তথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ--নির্জনে তাঁর চিন্তা ও নাম করতে বলছি কেন? সংসারে রাতদিন থাকলে অশান্তি। দেখনা এক হাত জমির জন্য ভায়ে ভায়ে খুনোখুনি। শিখরা (Sikhs) বলে, জমি, জরু আর টাকা এই তিনটির জন্য যত গোলমাল **অশান্তি**।

[রামচন্দ্র, সংসার ও যোগবাশিষ্ঠ—'মজার কুটি']

তোমরা সংরারে আছ তা ভয় কি? রাম যখন সংসার ত্যাগ করবার কথা বললেন, দশরথ চিন্তিত হয়ে বশিষ্ঠের শরণাগত হলেন। বশিষ্ঠ রামকে বললেন, রাম তুমি কেন সংসার ত্যাগ করবে? আমার সঙ্গে বিচার করো, ঈশ্বর ছাড়া কি সংসার? কি ত্যাগ করবে, কি বা গ্রহণ করবে। তিনি ছাড়া কিছুই নাই। তিনি **'ঈশ্বর মায়া জীব জগৎ'** রূপে প্রতীয়মান হচ্ছেন।"

বলরামের পিতা—বড় কঠিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ--সাধনের সময় এই সংসার 'ধোকার টাটী'; আবার জ্ঞানলাভ হবার পর, তাঁকে দর্শনের পর, এই সংসার 'মজার কুটি'।

[অবতার পুরুষে ঈশ্বরদর্শন—অবতার চৈতন্যদেব]

"বৈষ্ণবগ্রন্থে আছে বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।"

দিনপঞ্জিকা

২৫ বৈশাখ, ভাঃ ১৯ বৈশাখ, **৯মে,** ২৫ বহাগ, সংবৎ ৯ জৈষ্ঠ বদি, ২২ শাবান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৪, সূর্য্যাস্তি ঘ ৬।৪। **বুধবার,** নবমী রাত্রি ঘ ৭।০ মিঃ। ধনিষ্ঠানক্ষত্র দিবা ঘ ৭।২৪ মিঃ। বন্দ্ধযোগ দিবা ঘ ১১।৫৭ মিঃ। তৈতিলকরণ দিবা ঘ ৬।১৭ গতে গরকরণ, রাত্রি ঘ ৭।০ গতে বণিজকরণ। **জন্মে**--কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা,দিবা ঘ ৭।২৪ গতে বিংশোত্তরী রাহুর দশা। **মৃতে**—দোষ নাই। **যোগিনী**—পূর্ব্বে রাত্রি ঘ ৭।০ গতে উত্তরে। **কালবেলাদি** ঘ ৮।১৯ গতে ৯।৫৭ মধ্যে ও ১১।৩৪ গতে ১।১১ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ২।১৯ গতে ৩।৪২ মধ্যে। **যাত্রা**--নাই, দিবা ঘ ৭।২৪ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ঘ ৭।০ গতে মাত্র উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ঘ ৩।২৪ গতে পূর্ব্বেও নিষেধ, রাত্রি ঘ ৭।০ গতে মাত্র উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ। **শুভকর্ম্ম**--নাই। **বিবিধ**— নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। **বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মোৎসব। দেশনায়ক গোপালকৃষ্ণ গোখেলের জন্মদিবস। দানবীর মতিলাল শীলের তিরোভাব দিবস। বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস। অমৃতযোগ**--দিবা ঘ ৬।৪৪ মধ্যে ও ৯।২১ গতে ১১।১৬ মধ্যে ও ৩।২৮ গতে ৫।১১ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৬।৪৯ গতে ৯।০ মধ্যে ও ১।২১ গতে ৫।৪ মধ্যে। **মাহেন্দ্রযোগ**-- দিবা ঘ ১।৪৪ গতে ৩।২৮ মধ্যে বং রাত্রি ঘ ৯।০ গতে ১০।২৭ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

২৫ বৈশাখ, ভাঃ ১৯ বৈশাখ, ৯মে, ২২ শাবান। ২৫ বহাগ। উঃ ৫।৩, অঃ ৬।০২। বুধবার, নবমী সন্ধ্যা ঘ ৬।৫৯, সেহরী শেষ ৩।৩৩, ইফতার ৬।১১। **বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস/রবীন্দ্র জয়ন্তী (১৫৮তম)**

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

এ এক নূতন রবীন্দ্রনাথ ঃ কবি জীবনের কিছু কথা

আশিসবরণ সামন্ত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই। তাঁর কোনও বিকল্প নেই, উদাহরণ নেই। যেমন, কবিগুরুর গান দিয়েই বলা যায় 'আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না'। ঠিক তেমনি কবিকে জানার চেনার শেষ হবে না কোনদিনই। যতই দিন যাবে ততই যেন তিনি নূতন রূপে দেখা দেবেন। তাঁর নামকরণের বিষয়টি বিচার বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে 'তিনি কে' বা 'তিনি কী'। যদিও বলা হয় 'নামের বড়াই কোরো না কো/নাম নিয়ে কী হয়/ নামের মাঝে পাবে না কো/ সবার পরিচয়'। নাম যদিও ব্যক্তিত্ব প্রকাশের মাধ্যম নয়, তবুও তাঁর ক্ষেত্রে কী অদ্ভুতভাবে মিলে গেছে। 'রবি' মানে সূর্য অর্থাৎ কি না আমাদের চাক্ষুষ দেখা সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম এক দৃশ্যমান শক্তি, তার সঙ্গে আছে 'ইন্দ্র' অর্থাৎ কি না দেবতাদের রাজা, তারও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের প্রয়োজন হয় না, এদের 'নাথ' অর্থাৎ প্রভু। এদের সঙ্গে আছে 'ঠাকুর'। যা তাঁর ক্ষেত্রে এক সার্থক নাম। এখন এই 'ঠাকুর' পদবিটি কোথা থেকে এল তা দেখা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রত্যেকদিন যে মন্ত্রটি আবৃত্তি করে পিতৃপুরুষদের স্মরণ করতেন তার আদিতে ছিল জগন্নাথ কুশারীর মধ্যমপুত্র পুরুষোত্তম কুশারীর নাম।

পুরুষোত্তমাদ্বলরামঃ
বলরামাদ্ধরিহরঃ
হরিহরাদ্রমানন্দঃ
রামানন্দাম্মহেশঃ
জয়রামান্নীলমণিঃ
নীলমনের্রামলোচনঃ
রামলোচনাদ্দ্বারকানাথঃ
নমঃ পিতৃপুরুষেভ্যঃ
নমঃ পিতৃপুরুষেভ্যঃ।

পুরুষোত্তমের পিতা জগন্নাথ কুশারীই ঠাকুরবংশের আদিপুরুষ, ছিলেন পিঠাভোগের জমিদার। জগন্নাথ কুশারী বিয়ে করেন বর্তমান বাংলাদেশের যশোহর জেলার চেঙ্গুটিয়া পরগনার জমিদার গুরুবংশীয় দক্ষিনানাথ রায়চৌধুরির চার পুত্রের অন্যতম শুকদেব-এর কন্যাকে। এই শুকদেবের অপর দুই ভাই কামদেব ও জয়দেব মামুদ তাহির বা পীর আলি নামক এক শাসকের চক্রান্তে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। ফলস্বরূপ শুকদেব পিরালি সম্প্রদায়ভুক্ত বলে সমাজচ্যুত হন। পরবর্তীকালে বিখ্যাত পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়ে নিজেদের পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। তা সত্বেও কুশারী পরিবারও পিরালি সম্প্রদায়ের মধ্যেই পরিগণিত হতে থাকে।

কথিত আছে মহেশ্বর (মহেশ) ও শুকদেহ জ্ঞাতি কলহে বিরক্ত হয়ে গ্রাম বারোপাড়া ছেড়ে কলিকাতা গ্রামের দক্ষিণে গোবিন্দপুরে এসে বসবাস শুরু করেন। সেই সময়ে কলিকাতা ও সুতানুটিতে শেঠ-বসাকরা বিখ্যাত বণিক ছিলেন। ইংরেজদের বাণিজ্যিক নৌবহর গোবিন্দপুরের গঙ্গায় এসে দাঁড়াত। পঞ্চানন কুশারী এই সব ইংরেজদের মালপত্র জাহাজে তোলা ও নামানোর কাজে তদারকির জন্য নিযুক্ত হন। এই সকল কাজে তাঁর সহায়ক হিসাবে স্থানীয় হিন্দু সমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণির লোকেরা কাজ করত। সেইসকল লোক ভদ্রলোক তথা ব্রাহ্মণ পরিবারের উচ্চপদস্থ কর্মী দ্বারকানাথের নাম ধরে তো ডাকতে পারেন না। এমনকি পদবী ধরে ডাকতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন। তাই তারা পঞ্চানন কুশারীকে 'ঠাকুর মশাই' বলে ডাকতে শুরু করেন। পরে জাহাজের ক্যাপ্টেনদের কাছেও তিনি পঞ্চানন ঠাকুর বলে অভিহিত হন। তাঁদের কাগজপত্রে তাঁরা Tagore লিখতে শুরু করেন। এইভাবে কুশারী থেকে ঠাকুর পদবি প্রচলিত হয়।

এই কুশারী বংশীয়রা আবার নাকি শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ পরিবার থেকে এসেছেন বলে শোনা যায়। যাদের পদবি একসময় নাকি 'বন্দ্যোপাধ্যায়' ছিল। খ্রিষ্টিয় প্রথম সহস্রাব্দে যখন এদেশে বৌদ্ধপ্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় তখন তার হাত থেকে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করতে মহারাজ আদিশূর কনৌজ বা কান্যকুব্জ থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণ এনে বাংলাতে বসবাস শুরু করান। এঁরা হলেন শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ক্ষিতীশ, বাৎস্যগোত্রীয় সুধানিধি, সাবর্ণগোত্রীয় সৌভরি, ভরদ্বাজগোত্রীয় মেধাতিথি ও কাশ্যপগোত্রীয় বীতরাগ। এরাই নাকি যে কোনও বাঙালি ব্রাহ্মণের আদিপুরুষ। এই সূত্র ধরলে কুশারী ব্রাহ্মণরা ওই 'বন্দ্যোপাধ্যায়' পরিবারেরই উত্তম পুরুষ। যদিও ঐতিহাসিকেরা এ বিষয়ে একমত নন।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মহর্ষি দেবেন্দ্রেনাথ ঠাকুর ও সারদাদেবীর ৯ পুত্র এবং ৬ কন্যা ১৮৩৮--১৮৬৩ এই পঁচিশ বছরের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। ১। কন্যা—নামকরণের পূর্বেই মারা যান। ১৮৩৮-১৮৩৮--তাই সন্তান সন্ততির তালিকায় স্থান নেই। ২। দ্বিজেন্দ্রনাথ--১ম পুত্র-১৮৪০-১৯২৬ ৩। সত্যেন্দ্রনাথ-- ২য় পুত্র-১৮৪২-১৯২৩ ৪। হেমেন্দ্রনাথ— ৩য় পুত্র-১৮৪৪-১৮৮৪ ৫। বীরেন্দ্রনাথ-৪র্থ - ১৮৪৫-১৯১৫ ৬। সৌদামিনী-২য় কন্যা - ১৮৪৭-১৯২০-প্রথম কন্যা হিসাবে খ্যাত ৭। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ--৫ম পুত্র - ১৮৪৯-১৯২৫ ৮। সুকুমারী—৩য় কন্যা - ১৮৫০-১৮৬৪-দ্বিতীয় কন্যা হিসাবে খ্যাত। ৯। পুন্যেন্দ্রনাথ—ষষ্ঠ পুত্র (?) -১৮৫১-১৮৫৭। ১০। শরৎকুমারী—চতুর্থ কন্যা-১৮৫৪ - ১৯২০ - তৃতীয় কন্যা হিসাবে খ্যাত। ১১। স্বর্ণকুমারী—৫ম কন্যা (?) - ১৮৫৬-১৯৩২ - চতুর্থ কন্যা হিসাবে খ্যাত। ১২। বর্ণকুমারী ৬ষ্ঠ কন্যা - ১৮৫৭ - ১৯৪৮ - পঞ্চম কন্যা হিসাবে খ্যাত। ১৩। সোমেন্দ্রনাথ—৭ম পুত্র - ১৮৫৯ - ১৯২৩। ১৪। রবীন্দ্রনাথ--৮ম পুত্র - ১৮৬১-১৯৪১। ১৫। বুধেন্দ্রনাথ— ৯ম পুত্র - ১৮৬৩-১৮৬৪

কবিগুরুর বংশ পরিচয় জানার পর কৌতুহল হয় তাঁর সঠিক জন্মক্ষণ কী? প্রশ্ন থাকাই স্বাভাবিক। বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫ বৈশাখ সোমবার জোড়াসাঁকোর ভদ্রাসন বাড়িতে রাত ২ টো ২৮ মিঃ ৩৭ সেকেন্ড—এ তিনি প্রথম শ্বাস গ্রহণ করেন। জন্মতিথি কৃষ্ণা ত্রয়োদশী, রাশি-মীন, নক্ষত্র-রেবতী। বাংলা মতে একটি দিন সূর্যোদয় থেকে পরের দিন সূর্যোদয় পর্যন্ত। ইংরেজি মতে রাত্রি ১২ টার পর নতুন দিন হয়। তাহলে পরের দিন হয় মঙ্গলবার এবং ইংরেজি ৭ মে। বাংলা তারিখও ২৬ বৈশাখ হয়। কিন্তু, বাংলা মতে তাঁর জন্মক্ষণ গণ্য হয়। তাই জন্মদিন ২৫ বৈশাখ-ই।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম তৈরি কোষ্ঠীটি অবশ্য হারিয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে রামচন্দ্র আচার্য নামক জনৈক জ্যোতিষী ১২ টাকার বিনিময়ে নতুন কোষ্ঠী তৈরি করে দেন। রবীন্দ্রনাথ জন্মের পরক্ষণেই ধাত্রী মা দিগম্বরী ওরফে দিগমি-র কোলে আশ্রিত হন। মায়ের স্তনদুগ্ধের পরিবর্তে ধাত্রীমায়ের স্তনদুগ্ধ পান করেই তিনি বড়ো হয়েছেন। এখানেও রবীন্দ্রনাথ ব্যতিক্রমী। কবিগুরুর অন্নপ্রাশনও হয়েছিল ব্যতিক্রমভাবেই। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ অপৌত্তলিক প্রণামী জোতদার হন এই অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান থেকেই। অন্নপ্রাশনের যে পিঁড়িতে রবীন্দ্রনাথের নাম আলপনা দিয়ে লেখানো হয়েছিল মহর্ষির নির্দেশে সেই পিঁড়ির চারদিকে ছোটো ছোটো গর্ত করানো হয়। ওই গর্তগুলিতে মোমবাতি জ্বালিয়ে দেবার নির্দেশ দেন তিনি। এইভাবেই কবিজীবনের নামকরণ অনুষ্ঠানটি স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। উজ্জ্বল আলোকবর্তিকার মাঝে তাঁর নাম ছিল বলেই তিনি আজ রবীন্দ্রনাথ। অনাদি অনন্তকাল ধরে এই আলো মানবসমাজকে আলোকিত করবে।

কবিগুরু শিক্ষাগ্রহণেও ব্যতিক্রমী হয়ে উঠেছেন। বিদ্যালয় শিক্ষা তাঁর ভালো লাগত না। একটি ঘরের মধ্যে বন্দিজীবন কাটানো তাঁর কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। তাইতো তাঁর জন্যে ব্যবস্থা হয়েছিল বাড়িতে শিক্ষাগ্রহণের। গৃহশিক্ষক নির্ভর হয়েই তিনি শিক্ষার প্রতিটি বিষয়কে আয়ত্ব করতে পেরেছিলেন। তাঁর বিবাহও ছিল ব্যতিক্রমী ঘটনাপুঞ্জের সমষ্টিস্বরূপ। সাধারণত বর সেজে গুজে - সাঙ্গ-পাঙ্গ অর্থাৎ বরযাত্রী নিয়ে বিয়ে করার জন্য পাত্রীর বাড়িতে যান। ২২ বছর বয়সি পাত্র রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সে পথ ধরেন নি। তিনি বিয়ে করতে যাননি। তাঁর বাড়িতেই এসেছিলেন তাঁদেরই ঠাকুর এস্টেটের কর্মচারী কুলতলি গ্রামের বেণীমাধব রায় চৌধুরির এগারো বছর বয়সি কৃশ, রুগ্ন, নিরক্ষর এবং অত্যন্ত সাধারণ পল্লিবালিকা ভবতারিণী। যিনি পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত 'মৃণালিনী' নামে সমধিক পরিচিত হন। হয়ত বা কবি তাঁর প্রথম প্রেমিকা আনা তড়খরকে দেওয়া 'নলিনী' নামটি বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন আপন ধর্মপত্নীর নামের ভিতর দিয়ে। বিবাহ পর্ব জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে হয়েছিল বাংলা ১২৯০ সালে ২৪ অগ্রহায়ণ রবিবার।

কবির ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রিয়নাথ সেন-এর মাধ্যমে পাওয়া বিবাহের আমন্ত্রণপত্রটিও ছিল বেশ ব্যতিক্রমী।

'আগামী রবিবার ২৪ অগ্রহায়ণ তারিখ শুভদিনে শুভলগ্নে আমার পরমাত্মীয় শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভবিবাহ হইবেক। আপনি তদুপোলক্ষ্যে বৈকালে উক্ত দিবসে ৬নং জোড়াসাঁকোর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাসভবনে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহাদি সন্দর্শন করিয়া আমাকে এবং আত্মীয়বর্গকে বাধিত করিবেন।

ইতি অনুগত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'

রবীন্দ্রনাথের বিবাহ আসরে পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন না। কেন না, ওই দিনই শিলাইদহে তার জামাতা অর্থাৎ কন্যা সৌদামিনির স্বামী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। তিনি পুত্রের বিবাহসভায় থাকা অপেক্ষা জামাতার শেষকৃত্যে থাকার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সেখানে চলে যান। কবিগুরুর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এই রকমই ঘটনাবহুল। শুধু তাই নয়, অধিকাংশই ব্যতিক্রমী ঘটনা যা অন্যদের থেকে তাঁকে সম্পূর্ণ পৃথক করে রেখেছে।

ব্যাকরণের বাইরে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

বিভাংশু দত্ত

রবীন্দ্রনাথকে আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ তথা বানানের জনক বললে অতুক্তি হয় না। অতৎসম বা অসংস্কৃত শব্দে তিনি 'প্রায় সর্বত্র' দীর্ঘ স্বর (দীর্ঘ ঈ ও দীর্ঘ ঊ), মূর্ধণ্য 'ণ' পরিহার করেছেন সচেতনভাবে। রবীন্দ্রনাথের আগে কারও রচনায় আমরা অতৎসম শব্দে ই বা উ দেখিনি। রবীন্দ্রনাথ আমাদের ঈ-এর পরিবর্তে 'ই' জুড়ে লিখতে শিখিয়েছেন। 'বাড়ি', 'পাখি', 'বাঁশি', 'দাবি', 'দেরি', 'সাথি', 'বাকি' প্রভৃতি অসংস্কৃত শব্দ অতৎসম শব্দে 'ঊ'-র বদলে 'উ' লিখে বোঝালেন যে, 'উষা', 'ধুলো', 'পুজো', 'পুব', 'চুড়ো' বানানই সংগত। বিদেশি শব্দে 'ষ'-র বদলে 'স' দিয়ে তিনি লিখেছেন 'স্টেশন', 'মাস্টার', 'স্পোর্ট' প্রভৃতি শব্দ।

কালের বিচারে আধুনিক ব্যাকরণ ও বানানের ক্ষেত্রে তিনি অনেক এগিয়েছিলেন। যুক্তিসংগতভাবে বানানকে রবীন্দ্রনাথ সাবালক করেছেন। সংস্কৃতের বাঁধন বা শাসন থেকে মুক্ত করে বাংলা বানানকে তিনি স্বাবলম্বী করেছেন।

তবুও আমরা দেখেছি, কবিতায় বা গানে ছন্দের প্রয়োজনে ব্যাকরণকে তিনি অগ্রাহ্য করেছেন, বানানবিধিকে লঙ্ঘন করেছেন। কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

দোষ নেই যার তাকে নির্দোষ বলে, নির্দোষ নিরপরাধী অশুদ্ধ শব্দ। বহুব্রীহি সমাসে, আমরা জানি, উত্তরপদে বিশেষ্য হয়, তাই 'নির্দোষ' শুদ্ধ, 'নির্দোষী' অশুদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই অশুদ্ধ 'নির্দোষী' শব্দ ব্যবহার করেছেন। 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে তিনি লিখেছেন, 'নির্দোষী বিদেশীর রাখো প্রাণ, দুই দিন মাগিনু সময়।' আমাদের মনে হয়, পরে 'বিদেশী' শব্দের সঙ্গে মেলাতে তিনি অশুদ্ধ 'নির্দোষী' শব্দ ব্যবহার করেছেন। 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকে মদন চিত্রঙ্গদাকে বর দিতে গিয়ে বলেছেন, 'তাই আমি দিনু বর/কটাক্ষে রবে তব পঞ্চম শর/ মম পঞ্চম শর।' মদনদেবের পাঁচটা বাণ। ওই জন্যই মদনের নাম পঞ্চবাণ বা পঞ্চশর। মদনের পাঁচটা বাণ হল, 'সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন, স্তম্ভন। মদন তো চিত্রঙ্গদাকে পাঁচটা বাণই দিয়েছিলেন। পঞ্চম বাণটা হল স্তম্ভন। মদন নিশ্চয়ই চারটে বাণ রেখে ওই 'স্তম্ভন' বাণটাই চিত্রাঙ্গদাকে দেননি। এখানেও কি ছন্দের স্বার্থে রবীন্দ্রনাথ 'পঞ্চ'-এর বদলে 'পঞ্চম' শব্দটা ব্যবহার করেছেন?

'সকরুণ', 'সঠিক', 'সকাতর' শব্দগুলো ব্যাকরণগতভাবে অশুদ্ধ, কারণ ব্যাসবাক্য করলে মানে দাঁড়াবে 'ঠিকের সঙ্গে বর্তমান, কাতরের সঙ্গে বর্তমান, এখানে অর্থ তা তো নয়। অশুদ্ধ হলেও শব্দগুলো বাংলায় ব্যাপক প্রচলিত, তবে আলাদা অর্থে 'সঠিক' মানে একেবারে ঠিক। 'সকরুণ', ও 'সকাতর'-এর বাংলায় অর্থ যথাক্রমে অতিশয় করুণ ও অতিশয় কাতর। রবীন্দ্রনাথও অশুদ্ধ 'সকরুণ' ব্যবহার করেছেন তাঁর গানে, 'সকরুণ বেণু বাজায়ে কে যায়।' 'সকাতর'-কে ক্রিয়াবিশেষণ হিসাবে ব্যবহার করেছেন গানে, 'সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে শোনো শোনো পিতা'। অশুদ্ধ জানা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ এগুলো ব্যবহার করেছেন। কারণ এগুলো প্রতিষ্ঠিত অশুদ্ধ শব্দ। ব্যাকরণের নিয়মে বেঁধে এগুলোকে অশুদ্ধ বলে দূরে সরিয়ে রাখা ঠিক হবে না। বঙ্কিমচন্দ্রও 'সকাতর' ব্যবহার করেছেন। 'সক্ষম', 'সচর' এ দুটো অশুদ্ধ শব্দ তো ব্যাপকভাবে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত। সংস্কৃত শব্দ 'নিশা'। 'নিশি' অশুদ্ধ। বাংলায় সম্ভবত রবীন্দ্রনাথই প্রথমে এই অশুদ্ধ 'নিশি' শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। 'নিশিদিন ভরসা রাখিস', 'ছায়াদোলে দিবানিশি ধরি,' 'নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ'। সমাসের উত্তরপদে 'রাত্রি', শব্দ 'রাত্র' হয়, যেমন অহোরাত্র, দিবারাত্র। তাই 'দিবারাত্র' শুদ্ধ শব্দ। রবীন্দ্রনাথের গানে কিন্তু পাই 'দিবারাত্রি নামে মুক্তি নাচে বন্ধ'। বাংলায় সমার্থক জোড়া শব্দের ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। বাড়িঘর, সাজপোশাক, বনবাদাড়, তত্ত্বতালাশ, কল-কারখানা--এরকম প্রচুর। চিন্তাহরণ চক্রবর্তী এই ধরনের শব্দদ্বৈত্যকে 'আতিশয্যবাচক স্বতন্ত্র শব্দ' বলে অভিহিত করেছেন। 'অশ্রুজল' তেমনই একটি সমর্থক শব্দযুগ্ম। 'অশ্রু' মানেই তো চোখের জল, এরপরে আবার অতিরিক্ত জল কেন? রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুরু তথা তাঁর বৈবাহিক বিহারীলাল চক্রবর্তী প্রথম 'অশ্রুজল' ব্যবহার করেন তাঁর কবিতায়। রবীন্দ্রনাথ এই আপাত অশুদ্ধ 'অশ্রুজল'-কে জনপ্রিয় করেছেন তাঁর সাহিত্যে। 'তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে', 'তোমার তরুণহাসির অরুণ রাগে অশ্রুজলের করুণ রাগে।' 'অশ্রুবারি'ও আছে 'দীনদশা' ঘুচিল না, 'অশ্রুবারি মুছিল না।'

ক্ষণ + এক = ক্ষণেক। এটা হল সন্ধির নিয়ম। আবার 'ক্ষণ'-এর সঙ্গে 'ইক' প্রত্যয় যদি জোড়া হয় তাহলে হয় 'ইক' প্রত্যয়ের কারণে প্রথম স্বরটা বেড়ে গিয়ে শব্দটা হবে 'ক্ষাণিক'। কিন্তু কোনোভাবেই 'ক্ষণিক' শব্দটা তৈরি করা যাবে না। কিন্তু ব্যাকরণের নির্দিষ্ট গন্ডির বাইরের একটা নতুন শব্দ 'ক্ষণিক' যা একান্তভাবেই রবীন্দ্রসৃষ্ট শব্দ 'হে ক্ষণিকের অতিথি', শুদ্ধ 'ক্ষণেক'-ও রবীন্দ্ররচনায় অবিরল 'দিনেকের দেখা, তিলেকের সুখ, ক্ষণেকের তরে শুধু হাসিমুখ।'

'অভাগিনী', 'চন্ডালিকা', 'তাপসিনী', 'নাগিনী', 'হতভাগিনী' প্রভৃতি ব্যাকরণগত ভাবে অশুদ্ধ শব্দ। এগুলোর শুদ্ধ রূপ যথাক্রমে 'অভাগি (অভাগী), 'চন্ডালী', 'তাপস', নাগী' ও 'হতভাগী' বা 'হতভাগি'। অশুদ্ধ হলেও এ সমস্ত শব্দ বাংলায় ভালোই চলে। বৈষ্ণব সাহিত্যে আমরা পেয়েছি 'রজকিনি প্রেম নিকষিত হেম কামগন্ধ নাহি তায়।' রবীন্দ্রনাথও এই ধরনের শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন তাঁর রচনায়। 'যে অভাগিনী পাপের ভারে চরণে তব বিনতা' ('শ্যামা'), 'ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা ছি, ওযে চন্ডালিনীর ঝি' ('চন্ডালিকা')। অবশ্য এই 'চন্ডালিকা'-য় কবি শুদ্ধ 'চন্ডালী'ও ব্যবহার করেছেন, 'আমি চন্ডালী--সে যে মিথ্যা, সে যে মিথ্যা, সে যে দারণ মিথ্যা'। 'মণিপুরনৃপদুহিতা তোমারে চিনি তাপসিনী' (চিত্রঙ্গদা') (এখানে 'চিনি'-র সঙ্গে মেলানোর জন্যেই কি 'তাপসিনী'-র ব্যবহার?) 'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস' ('পরিশেষ') 'হা হতভাগিনী, একি অভ্যর্থনা মহতের' ('চিত্রাঙ্গদা')।

সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে বিশেষ্য স্ত্রীলিঙ্গ হলে তার বিশেষণটাও স্ত্রীলিঙ্গ হবে। জীবনের শেষ বছরে সেই নিয়ম মেনে তিনি 'ঐকতান' কবিতায় লিখলেন 'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি?' কিন্তু এর প্রায় অর্ধ শতাব্দ আগে এই নিয়ম ভেঙে 'বঙ্গমাতা' কবিতায় তিনি লিখলেন 'সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি।'

সম্বোধনে ভেদাভেদ : রবীন্দ্রনাথ একই রচনায় ব্যক্তির উদ্দেশে কখনও 'তুই', কখনও আবার 'তুমি' ব্যবহার করেছেন। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি, 'মা গো, আমায় ছুটি দিতে বল্, সকাল থেকে পড়েছি যে মেলা / এখন আমি তোমার ঘরে বসে, করব শুধুই পড়াপড়া খেলা' ('প্রশ্ন')। মাকে একবার তুই তুই করে 'বল' বলছেন, পরক্ষণেই 'এখন আমি তোমার ঘরে বসে'। ওই 'শিশু' কাব্যেরই 'অপযশ' কবিতায় একইরকম সম্বোধন ভেদ। 'বাছা রে, তোর চক্ষে জল কেন? কে তোরে যে কী বলেছে আমায় খুলে বল্। লিখতে গিয়ে হাতে মুখে মেখেছ সব কালি, নোংরা বলে তাই দিয়েছ গালি।' যার উদ্দেশে 'তোর', 'তোরে' পরে তাকে 'মেখেছ' বলা হচ্ছে। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে'। একই লাইনে 'তোর' ও 'চলো'। 'শ্যামা' নাটকের একেবারে শেষে শ্যামা যখন শেষবারের মতো ক্ষমা প্রার্থনা করে বজ্রসেন তখন রাগে অনুতাপে শ্যামার উদ্দেশে বলে ওঠে, 'কে এলি কেন এলি কেন এলি ফিরে যাও যাও যাও যাও চলে যাও'। 'এলি' আর 'যাও'—একেবারে এক লাইনে। আরও এরকম দৃষ্টান্ত আছে। তালিকা দীর্ঘ করব না।

এইভাবে রবীন্দ্রনাথ বারেবারে ব্যাকরণের বেড়াজাল ভেদ করে ব্যাকরণবিধান-বানানবিধি শিথিল করে সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য শব্দ বা শব্দবন্ধ। আজ সেগুলোই হয়ে উঠেছে আমাদের সাহিত্য-সম্পদ।

এ প্রসঙ্গে চিন্তহরণ চক্রবর্তীর একটা লেখা দিয়েই আলোচনা শেষ করব। 'বহুলপ্রচলিত প্রয়োগ আপাতদৃষ্টিতে যতই নিয়মবিরুদ্ধ হউক না কেন, প্রাচীন নিয়মকে একটু ব্যাপক ও শিথিল করিয়া বা নূতন নিয়ম আবিষ্কার করিয়া তাহার সমর্থনের চেষ্টা বৈয়াকরণের অবশ্যকর্তব্যকর্ম'। তাছাড়া রবীন্দ্রপ্রয়োগকে আর্য প্রয়োগও বলা যায়। তাঁর মতো এত বড়ো ঋষি আর কে আছে?

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

পাঠকের দরবারে

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বাদলেরবিরুদ্ধে নয়।...........সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়